পূর্ব বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ বিরোধিতা, ১৯৪৭–৫০ : রাষ্ট্রের স্বরূপ

আহমেদ কামাল*

সার–সংক্ষেপ : ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা থেকে রাজনৈতিক মুক্তি লাভের ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকরা ভূমি ও খাজনা প্রশ্ন সমাধানের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে যা পরিণতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের রূপলাভ করে। এই বিদ্রোহগুলি নানকর, টংক, নাচোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। তৎকালীন কম্যুনিস্ট নেতৃত্বের সাহায্যে কৃষকরা ভূমি ও খাজনা প্রশ্নের একটি দ্রুত সমাধান চায়। কিন্তু কৃষকদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও তৎপরতা ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মতোই। উপরন্তু, নতুন রাষ্ট্রের আমলারা এই সকল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে এমন সব বাগধারা ও ভাষা ব্যবহার করে যা কিনা জাতিকে বিভক্ত করতেই সহায়তা করেছিল। মূলত এই নিবন্ধে যে বিষয়টি বিশেষভাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে সেটি হচ্ছে কৃষক বিদ্রোহ দমনে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব কিভাবে আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং সেই আমলা–নির্ভরশীল রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা লাভ করা যায়।

এক

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তদানীন্তন পূর্ব বাংলার শাসক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিরাজমান সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার এক জোর ও ভীতসন্ত্রস্ত তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উচ্চাশা ও ভীতি পরিলক্ষিত হয়।[১] পাকিস্তান প্রাপ্তির আনন্দাতিশয্য শুধু স্বল্পস্থায়ীই হয়নি, প্রকৃতপক্ষে অনেক উপজাতীয় ও দরিদ্র মুসলমানদের জন্য তা শীঘ্র তিক্ত হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সাল পেরোনোর আগেই ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রান্তে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডের সাথে সংঘর্ষে রত হয়। এ সংঘর্ষ দরখাস্ত প্রদান থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সংগঠিত কৃষকদের পক্ষ থেকে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা ১৯৫০ পার হয়ে প্রায় ১৯৫১–এর মাঝামাঝি পর্যন্ত বহাল থাকে।

কম্যুনিস্ট কর্মী ও ঐতিহাসিকেরা এ সকল বিরোধকে সাধারণভাবে হাজং, নানকর ও নাচোল বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। হাজংরা ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে সীমান্তের উপজাতীয়, আর নানকরেরা সিলেটের সেবাস্বত্বভোগী চাষী। নাচোল বিদ্রোহের নামটির উৎপত্তি হয় ঐ নামের এক থানা থেকে, সেখানে সাঁওতাল ও দরিদ্র মুসলমান

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃষকেরা ১৯৫০–এর জানুয়ারী মাসে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। এই সমস্ত অঞ্চলই ভারতীয় ডোমিনিয়নের সীমান্তবর্তী এলাকা। তাই যদিও স্থানীয়তা, কৃষকদের সামাজিক অস্তিত্বের প্রকার ও অবস্থানভেদে বিপ্লবীরা এই সকল বিদ্রোহের নামকরণ করেছিলেন, কর্তৃপক্ষের ভাষায় সর্বত্রই এদের নাম ছিল 'কম্যুনিষ্ট বিশৃঙ্খলা'। বস্তুত কিছুকাল আগেও এক ইংরেজী সাপ্তাহিকে এক প্রাবন্ধিকের লেখা থেকে বুঝা যায় এই বিদ্রোহের সে সময়কার সরকারী ভাষ্য এখনও প্রভাব রেখে চলেছে।[২]

এ সকল বিদ্রোহের ব্যাপারে বিপ্লবী ইতিহাস লিখন দুটি ভুল করেছে। প্রথমত, এতে এমন একটা পরিতৃপ্তি সুস্পষ্ট যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে বাম রোমাঞ্চবাদের দ্বারা প্রভাবিত কৃষকদের এই কার্যাবলী মূলত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রকৃত ধারার সাথে সম্পর্কচ্যুত এক প্রান্তিক ধারা।[৩] দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত শাসক গোষ্ঠীর বিদ্রোহ–বিরোধী যে কার্যাবলী তাকে নগণ্য তাত্ত্বিক সমস্যা হিসাবে দেখা হয়েছে। পক্ষান্তরে বাঙালী জাতীয়তাবাদ এই বিদ্রোহসমূহকে সমাজ ব্যবস্থায় কৃষকের নগণ্য অবস্থানের মতোই মর্যাদা দিয়েছে।[৪]

এটা অনস্বীকার্য যে, বাইরের এজেন্ট অর্থাৎ রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, বুদ্ধিজীবীরা এসকল বিদ্রোহের উপর যথেষ্ট পরিমাণে হস্তক্ষেপ করেছিল। তবে এ সকল বিদ্রোহে দেখা যায় যে, বহিরাগত সংগঠন ও তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপে নিপীড়িতরা শুধু লাল ঝান্ডা, পার্টি, শ্লোগান এবং বিচার সংক্রান্ত রাজনৈতিক তথ্য পেয়েছিল। কৃষকরা তাঁদের কার্যাবলীতে নিঃসন্দেহে নতুন জাতির মধ্যে তাঁদের স্থান নিরূপণ করতে চেয়েছিল। এ সকল কাজ মূলত গণতান্ত্রিক সংগ্রামেরই অংশ। আর এর লক্ষ্য ছিল সমাজের জমিদারী পদ্ধতি বিলোপ, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরেও যা কৃষককুলের এক বিরাট অংশকে শোষণ করে চলছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতার বাস্তবতা থেকে কৃষকদের উল্লেখ্য অংশ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয় ও তাদের শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে। ফলস্বরূপ, নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে এই কৃষককুলকে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়।

এই নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক গৃহীত ঔপনিবেশিক আমলের নিগ্রহ নীতি অব্যাহত রেখেও বৃটিশ রাজ থেকে নিজেদেরকে ভিন্ন আইনানুগ ভিত্তি দেয়া এবং একই সঙ্গে কৃষককুলকে কিভাবে নতুন রাষ্ট্রে একীভূত করা যায় সেই কৌশলের বিশ্লেষণ। বাস্তবে এই পার্থক্য ছিল সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত প্রান্তকরণ বাগাড়ম্বড়ে। ঔপনিবেশিক আমলের অভ্যাস থেকে এটা ছিল উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিন্ন। ধর্মীয় বাগধারা দৃঢ়ভাবে ব্যবহার করে এই বাগাড়াম্বর নতুন রাষ্ট্রকে সম্ভাব্য জাতির বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে ধর্মীয় তত্ত্ব বিরাজমান ছিল তা কিভাবে জনসাধারণ ও জাতিকে একীভূত করার ক্ষমতা নিঃশেষ করে ফেলে তার সম্বন্ধে এ সকল কৃষক বিদ্রোহ দমনের ইতিহাস এক আপাত বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দেয়।

দুই

১৯৪৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য যতীন্দ্রনাথ ভদ্র জরুরী গণগুরুত্বপূর্ণ ও সম্প্রতি সংঘটিত একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় আলোচনার জন্য মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেনঃ

> ১৯৪৯ সালের ১৮ থেকে ২৪শে আগস্ট সশস্ত্র পুলিশ এবং সৈন্যরা সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার ও বড়লেখা থানার সনেশ্বর, আহিরকিঞ্চি, মেহারা, উজিরপুর, উলুরী, নয়গ্রাম, পানিশলাই ও যোগীকোনা গ্রামের হিন্দু জনসাধারণের উপর অমানুষিক ও বর্বর অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচার মহিলা নিগ্রহ, লুট, সম্পত্তি ধ্বংস ও দেবদেবীর মূর্তি বিনষ্টকরণের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৪৯ সালের ১৮ই আগস্ট সশস্ত্র পুলিশের গুলিবর্ষণে সনেশ্বরে ৫ জনের মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে, যদিও এলাকাতে সম্পূর্ণ শান্তি ফিরে আসে, ২১শে আগস্ট পুলিশের সঙ্গে একই জায়গাতে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস যোগ দেয়। এদেরকে নিরপরাধ হিন্দুদের উপর লেলিয়ে দেয়া হয়।
>
> ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও সশস্ত্র পুলিশের সাথে মুসলিম জনতাও যোগ দেয়। মহিলাদের সম্ভ্রম হানি করা হয়। গবাদী পশু, ধান, নগদ টাকা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সহ ধন সম্পত্তি লুট করা হয়। মহিলাদের গা থেকে অলংকার ছিনিয়ে নেয়া হয়। ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলা হয় আর দেবদেবীর মূর্তির অসম্মান করা হয়। এই অত্যাচার প্রায় এক সপ্তাহ চলে।[৫]

বিষয়টির উপর আইন পরিষদে অনুষ্ঠিত আলোচনায় কয়েকজন বিরোধী দলীয় সদস্য ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলীয় একজন সদস্য অংশ নেন। মূলতবী প্রস্তাব ও তৎপরবর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন একটি বিবৃতি দেন। বিরোধী দলীয় সদস্যদের বক্তব্যের উত্তর দেয়ার জন্য তিনি ৪৫ মিনিট সময় চেয়ে নেন। বিবৃতিতে তিনি স্বাধীনতার পর থেকে সিলেট্‌ জেলায় সংঘটিত ঘটনাবলীর ইতিহাস ও প্রকৃতির সারসংক্ষেপ প্রদান করেন। বিশ্লেষণের স্বার্থে আমি বিবৃতি থেকে একটি সুদীর্ঘ অংশ তুলে ধরবোঃ

> আমি – যাঁরা ঘটনার সময়ে সরাসরিভাবে জড়িত – যেমন পুলিশ, ডিএসপি, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বক্তব্য পেশ করছি না। আমার বক্তৃতার ভিত্তি হচ্ছে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন। তফসিলী

> সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য আমার পুরো সমবেদনা রয়েছে– কেননা তাঁরা এই ঘটনায় জড়িত। কিন্তু আমি একই সঙ্গে তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে এই অনুরোধ করবো যে, তাঁরা যেন তাঁদের সম্প্রদায়ের অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও মূর্খ সদস্যদেরকে কম্যুনিষ্ট ও তাদের সমর্থকদের সংস্রব থেকে বিরত রাখেন। জমিদারী ও নানকর পদ্ধতির অবসানের নামে এই কম্যুনিস্ট কর্মীরা কিছু সংখ্যক মুসলিম নানকর প্রজার সাহায্য লাভ করেন। এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশৃঙ্খলার দীক্ষা দেয়া এবং জনগণকে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এমন কাজে উত্তেজিত করা। ১৯৪৮–এর আগস্ট মাসে কিছু পুলিশ কনষ্টেবল যখন দাঙ্গা ও বেআইনী আটকের অভিযোগে অভিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিলেন তখন এক উন্মত্ত সশস্ত্র জনতা তাদেরকে আক্রমণ করে আহত করে। ফলস্বরূপ পুলিশকে গুলি ছুড়তে হয় ও এতে এক ব্যক্তি (মুসলিম ধর্মাবলম্বী) নিহত হন। এই গুলি বর্ষণে মূলত মুসলিম সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে তাদের উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়াও হয়। কিন্তু কম্যুনিষ্ট উৎসাহিত অমুসলমান পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপ, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র ও সরকারকে অসম্মানজনক স্থানে ফেলা, তা অব্যাহত থাকে। ···· দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে পুলিশ সমগ্র এলাকার আইন শৃংখলা পালনকারী জনসাধারণের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি প্রদান করার জন্য অবস্থান গ্রহণ করে। ···· সাধারণ অভিযোগ সমুহের উত্তরে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে, মহিলাদের সম্ভ্রম হানি, দেব দেবীদের বিগ্রহ বিনষ্ট বা অবমাননা অথবা মন্দির বিনষ্টকরণে কিংবা পুলিশ বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস কর্তৃক লুট করার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি।[৬]

মুখ্যমন্ত্রী নানকর কৃষকদের আন্দোলনকে ভূস্বামীদের সাথে তাদের সম্পর্ক পুনর্নির্ধারনের প্রচেষ্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে তিনি ক্রমাগত আইন লংঘন ও বিশৃংখলার যুক্তি দেখিয়ে কৃষক আন্দোলনের অবমূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেন। পরিষদে মুসলিম লীগ সদস্যরা কৃষক আন্দোলনকে রাষ্ট্রবৈরিতা বলে উল্লেখ করেন। মন্ত্রীদের বক্তৃতা থেকেও দেখা যায় যে, এই বৈরী গোষ্ঠির অন্য নাম ছিল কম্যুনিষ্ট, শেষোক্তদেরকে আবার গ্রামাঞ্চলে গন্ডগোল পাকিয়ে তোলার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।[৭]

মুখ্যমন্ত্রী পাকিস্তানকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্ররত কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে গৃহীত পুলিশ ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে অভিহিত করেন। তিনি ১৯৩৭ সন থেকে বিয়ানীবাজার ও

বড়লেখা থানায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রারম্ভ থেকে ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, কম্যুনিস্টরা 'দরিদ্র ও অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ' জনগণের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এই কারণে যে, জনগণ তাদের নিজস্বার্থ বুঝতে সক্ষম নয়।

এই অঞ্চলের ইতিহাসকে 'খারাপ ইতিহাস' বলার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে যথেষ্ট কারণও ছিল। কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসকে খারাপ অথবা ভালো এই ধরনের নৈতিক মূল্যায়নে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে ইতিহাসকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা শুধু প্রতিফলিত হয়নি, একই সঙ্গে এই বাগধারা থেকে কৃষকদের অতীতের কিছু কিছু দিককে আত্মস্থ বা প্রান্তস্থ করার জন্য তৎকালীন নেতৃবৃন্দ কি ধরনের নীতিমালা ব্যবহার করতেন, তাও দেখাতে সাহায্য করে।

এই আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয় একটি উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোতে। এ ক্ষেত্রে ১৯১৯ সনের আইনের দ্বারা সৃষ্ট আইন পরিষদে। সেখানে সরকারী দলের সদস্যরা যতীন্দ্রনাথ ভদ্র কর্তৃক উত্থাপিত মূলতবী প্রস্তাবটির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। পক্ষান্তরে যে প্রতিবেদনের উপরে ভিত্তি করে মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেন তার সত্যতা সম্পর্কে বিরোধী দলীয় সদস্যরাও প্রশ্ন তোলেন, তবে এই মূলতবী প্রস্তাব সুক্ষ্ম বিধিগত দিকের আশ্রয় না নিয়ে আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। কিন্তু নাচোলের ঘটনাবলী সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনার অনুমতি মুখ্যমন্ত্রী দেননি। ১৯৫০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কিছু সংখ্যক বিরোধী দলীয় সর্দস্য নাচোলে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনার জন্য যে মুলতবী প্রস্তাব আনয়ন করেন তা বিধিগত প্রশ্নে বাতিল হয়ে যায়। যে সকল ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক পরিষদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের মতপার্থক্য প্রবল হয়ে ওঠে এবার তার প্রসঙ্গ টানা যাক।

তিন

বৃটিশ রাজ শাসনের শেষে বাংলা ও আসামের বিভক্তিকরণ কৃষকদের, বিশেষত হাজং ও নানকরদের, সংগ্রামের গতিধারাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঐ সময়ের অনেক কম্যুনিস্ট কর্মী এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস করেন যে, একটি সুস্থ কৃষক আন্দোলন যাতে শ্রেণী সম্পর্ককে বৈপ্লবিক পন্থায় পরিবর্তন করতে বা গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পরিণত না হতে পারে সেজন্য সেবাদাসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে এই বিভক্তিকরণ ছিল ইংরেজ শাসকদের এক সুচিন্তিত চক্রান্ত।[৮] কম্যুনিস্ট এবং কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে প্রত্যাশার জন্ম দেয় তা চলমান সংগ্রামকে ঐ মুহূর্তে নিস্প্রয়োজন প্রতীয়মান করে দেয়।

তবে কৃষকদের মাঝে এই নতুন জাতি–রাষ্ট্ররাজের শাসনামলের শেষ দিনগুলোতে অমীমাংসিত দাবী ও প্রত্যাশাসমূকে জাগিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, নতুন শাসক গোষ্ঠী কৃষকদের মাঝে নতুন আকাঙক্ষারও সৃষ্টি করে। জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্যের অভিমত হচ্ছে, ১৯৪৯ সনে পুনর্বার যে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয় তা মুলত পূর্ববর্তীগুলো থেকে আলাদা ছিল এবং এদের মুল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৮ সনে কম্যুনিষ্ট পার্টির কোলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত নতুন লাইন অনুসারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। আমরা ভট্টাচার্য থেকে ভিন্ন মত পোষণ করি।[৯]

সন্দেহ নেই এই আন্দোলন সংগঠনে কম্যুনিষ্টদের অনেকখানি ভূমিকা ছিল। ১৫ আগস্ট উপজাতীয় হাজংরা রাজনেতিক স্বাধীনতার উৎসবে পাকিস্তানী পতাকার সঙ্গে কম্যুনিষ্ট উপস্থিতির প্রতিফলনকারী লার ঝান্ডাও উত্তোলন করেন।[১০] এসব সত্ত্বেও ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে নানকর বিদ্রোহ আইনানুগ কাঠামোতে আটকা পড়ে, ফলস্বরূপ এর বিপ্লবী সারবত্তার মুখ্য অংশ লুপ্ত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের নানকর আন্দোলনে জড়িত নেতৃস্থানীয় কম্যুনিষ্ট কর্মী অজয় ভট্টাচার্য লিখেছেন, '*এই বিদ্রোহ থেকে অর্থনৈতিক লাভ ও সমাজ সংস্কার বাদে অধিকতর কিছু প্রত্যাশার ছিল না।*'[১১] পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কৃষি সংস্কারের প্রতি মুসলিম লীগ নেতৃত্বের প্রকাশ্য সমর্থন, হিন্দু ও উপজাতীয় কৃষকদের বিভ্রান্ত অবস্থা এবং একই সঙ্গে মুসলিম কৃষকদের আশাবাদ কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বকে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দিতে বাধ্য করে। এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, "*বর্তমান বছরে জাতীয় সরকার ক্ষমতায় রয়েছেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাওয়ার পরিবর্তে আমরা তাঁদেরকে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালনের আরেকটা সুযোগ দিতে চাই, · · · তাই এ বছর* শস্যের ভাগ পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া উচিত।"[১২]

কিন্তু ১৯৪৯ সালের ১৫ই আগস্ট ময়মনসিংহ জেলার দূর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী ও ভাটপুরে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ সভা ও বিক্ষোভ শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। নতুন রাষ্ট্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা ছাড়াও তারা ঔপনিবেশিক সরকারের আমলে হাজং কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে জারীকৃত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারী ব্যবস্থাপনার অবসান দাবী করেন।[১৩]

হাজং নেতৃবৃন্দ ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে ১৯৪৮ সনের জানুয়ারী মাসে প্রাদেশিক গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করে খাজনার টংক ব্যবস্থার অবসান দাবী করেন।[১৪] তেভাগা অধ্যাদেশ জারী করার জন্যও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটে কম্যুনিষ্ট পার্টির আহবান সত্ত্বেও বিদ্রোহ চলতে থাকে। সমস্ত পরাজয় সত্ত্বেও নানকরগণ জমিদার বাড়ীতে ফেরত গিয়ে কাজ করতে অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায়, সমস্যার সমাধানের জন্য কিছু সংখ্যক নানকর নেতা মুসলিম লীগের সাথে যোগাযোগ করেন।[১৫]

শুরুতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বেশ সফল হয়, বিশেষ করে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে এই ঘটনা ঘটে। বর্গাচাষী ও জমিদারদের মধ্যে একটা সর্বসম্মত সমাধানে স্থানীয় সার্কেল অফিসার সফল হন। নড়াইলে কিছু সংখ্যক জমিদার তেভাগা মেনে নেন এবং বর্গাচাষীদেরকে রশিদ দেয়া শুরু করেন। জমিদাররা ফসল বিতরণের এই নিয়ম মেনে নেয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করলে খুলনায় বড়ো বড়ো সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নীলফামারীতে এক স্মারকলিপিতে জমিদারী ব্যবস্থার অবসান, দেশ বিভাগ পূর্বকালের তেভাগা মোকদ্দমার প্রত্যাহার ও উচ্ছেদকৃত কৃষকদের পুনর্বাসন এবং বর্গাচাষীদের বাড়ীতে শস্য রাখার দাবী জানানো হয়। দিনাজপুরেও এই ধরনের সভার আয়োজন করা হয়।[১৬] ভূমি সংস্কারের দাবীতে ১৯৪৮ সনের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা জেলায় এক বিরাট সমাবেশ ঘটে।[১৭]

এই দাবী–দাওয়া জানাতে সংগঠিত কৃষক ও শ্রমিকগণ রাজের শেষ দিনগুলোর অবস্থার সাথে তুলনীয় পন্থা অবলম্বন করেন, যেমন দরখাস্ত ও স্মারকলিপি প্রদান, জনসভা ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলসমূহ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিক্ষোভ ও দাবী পেশ ও প্রকাশের জন্য এজাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করত। অন্যকথায় জনসমর্থিত আন্দোলনসমূহের কৃষ্টিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের আধা উদারনৈতিক অভ্যাসাদি স্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছিল এবং এসকল আন্দোলন উদারনৈতিক বাগধারায় প্রভাবিত দলসমূহের প্রতি নৃতুন শাসকগোষ্ঠীর সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশা করত। কিন্তু উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নেয়াতে কৃষক নেতাগণ উচ্চবর্গের নেতৃবৃন্দের কাছে অবহেলিত হন এবং ফলশ্রুতিতে তাঁদেরকে আরও সংগঠিত সংগ্রামে রত হতে হয়ঃ ইসমাইল আলী ও নানকরদের সংগ্রাম এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চার

নানকর সমস্যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের জন্য কিছু সংখ্যক কর্মী, বিশেষ করে ইসমাইল আলীর মতো লোকেরা যারা সিলেটের গণভোটের প্রশ্নে কৃষক সভার অবস্থান দেখে হতাশ হয়েছিলেন, তাঁরা স্বাধীনতার পরে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করেন। একই সময় আইন পরিষদে মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এবং জমিদার আবদুর রব কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি নানকরদের কাছে আগের অবস্থানে ফিরে যাবার প্রস্তাব দেন। এর অর্থ ছিল জমিদারদের কর্তৃত্ব ও বল প্রয়োগ মেনে নেয়া। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি নানকরদের রাজের শেষ দিনগুলোতে সংগ্রামের মাধ্যমে কষ্টার্জিত সুফলগুলো পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেন।[১৮]

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা এতে সম্মত হননি এবং ফলস্বরূপ ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখ দিনগত রাতে পুলিশ কৃষক সভা অফিসে অভিযান চালিয়ে দুজন কম্যুনিষ্ট

নেতাকে গ্রেফতার করে। একই সময়ে তারা ইসমাইল আলীকেও গ্রেফতার করে। ইসমাইল আলী মুসলিম লীগের কাছ থেকে নানকরদের জন্য রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।[১৯] ১৯৪৭ সনের ১১ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের একমাস পরেই সাপ্তাহিক *সংহতি* সিলেট জেলায় নানকরদের অবস্থার উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সাপ্তাহিকীটি কৃষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু ও পুলিশের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে জমিদারদের পক্ষ নেয়ার অভিযোগ আনয়ন করে।[২০]

বিয়ানী বাজার, গোলাপগঞ্জ ও বড়লেখা থানার কৃষকরা যখন ১৬ই সেপ্টেম্বর লাউটাবাহাদুরপুরে পুলিশী অত্যাচারে ধর্মঘট আহ্বান করে কাজ বন্ধ করে দেয় তখন উদারনৈতিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সীমানা শেষ হয়ে যায়। কৃষকগণ অত্যাচারী জমিদারদেরকে একঘরে করারও সিদ্ধান্ত নেন। এর পর পরই কৃষক সভা সিলেট শহরে এক গণবিক্ষোভের আয়োজন করেন। কৃষকরা দূরবর্তী অঞ্চল থেকে, কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ থেকে ২৫ মাইল দূর থেকে, এই গণ প্রতিবাদে যোগ দিতে আসেন। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের পরে কৃষকদের দাবী জোরদার করার জন্য একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২১] কৃষকরা এ জাতীয় প্রতিবাদ ও দাবী জানানোতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এজাতীয় পদ্ধতি বাইরের রাজনীতি ও সংগঠনের সংস্পর্শে আসার পর থেকে প্রায়শই ব্যবহার করে আসছিলেন।

নানকর কৃষকরা অবশ্য তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখে চলছিলেন। আর এটা চলছিল কৃষক সভার রাজনৈতিক স্বাধীনতা উত্তর বিভ্রান্তির কারণে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দানে ব্যর্থতা ও সরকারের সাথে এর সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান সত্ত্বেও। পার্টির কাছ থেকে কোন প্রকার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে কৃষকগণ জমিদারদেরকে সামাজিকভাবে একঘরে করতে সমর্থ হন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে এটা ছিল একটা ঐতিহ্যগত প্রতিবাদেররীতি।[২২] ফলস্বরূপ অক্টোবর মাসের শেষ দিকে পুলিশী অত্যাচার শুরু হয় এবং ২৩শে নভেম্বর কৃষকরা একে রুখে দাঁড়ান। ঐদিন আন্দোলন সিলেট জেলার বিয়ানী বাজার থানায় বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। ফসল কাটার শুরুতে কৃষকগণ ক্ষেত থেকে ধান কেটে নেয়া শুরু করেন। জমিদারগণ পুলিশের কাছে চুরির মামলা রুজু করেন। এ জাতীয় ধান চুরীর মোকদ্দমায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে জনতা এই চারজন অভিযুক্তকে উদ্ধার করার জন্য বাহাদুরপুরস্থ পুলিশ দলকে আক্রমণ করে।[২৩] সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী এই আক্রমণে ৫০০ লোক অংশগ্রহণ করে, আক্রমণকারীদের ৫৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। ৩০ জন গ্রেপ্তার হন এবং অবশিষ্টরা গা ঢাকা দেন।[২৪] ২৫শে নভেম্বর কৃষক সভার লাউটাবাহাদুরপুর শাখা পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বরাবরে নিম্নলিখিত তারবার্তা প্রেরণ করেঃ

> জমিদারেরা পুলিশী সাহায্য নিয়ে বেআইনীভাবে নানকর কৃষকদের ধান নিয়ে যাচ্ছে। দারোগা সাহেব এলোপাথাড়ীভাবে কৃষকদের গ্রেফতার করছেন। গতকাল দারোগা সাহেব ৯ জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেপ্তারকৃত লোকদের নিষ্ঠুরভাবে পিটানো হচ্ছে। দারোগার বেআইনী কাজে জীবন ও ফসলের কোন নিরাপত্তা নেই। অনতি বিলম্বে আপনার হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।[২৫]

প্রাদেশিক কৃষক সভা ২৭শে নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আরেকটি তারবার্তা পাঠিয়ে একই বক্তব্য তুলে ধরেন। তারা আরো জানান যে, সশস্ত্র পুলিশকে পূনর্বার লাউটাবাহাদুরপুরে মোতায়েন করা হয়েছে এবং পুলিশ জমিদারদের পক্ষ নিচ্ছেন। রাজপরবর্তী আমলে এজাতীয় ঘটনা অনেক নানকর কর্মী ও সমর্থককে বিভ্রান্ত করে। সংহতি পত্রিকায় সরাসরি এই প্রশ্ন তোলা হলো, পাকিস্তানেও কি কৃষকদের উপর পুলিশী নির্যাতনের শেষ হবেনা?[২৬]

ইতোমধ্যে নানকর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রস্তাবে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৪৮ সনের ২ জানুয়ারী জমিদার ও নানকরদের মধ্যে একটি সমঝোতায় পৌঁছে। কমিটির কাছে গ্রহণযোগ্য নানকর নেতৃবৃন্দ নানকরদের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী কম্যুনিষ্ট কর্মীরা আলোচনায় অংশ নিতে পারেননি।[২৭] মীমাংসার অন্যান্য শর্তের সাথে নানকর বিরোধ-উদ্ভূত সকল ফৌজদারী মামলার প্রত্যাহারের জন্য কমিটি সুপারিশ করেছিল।[২৮] ১৯৪৮ সনের ১৫ই জনুয়ারী প্রধানমন্ত্রী লিখিতভাবে এই সমঝোতার শর্তসমূহ মেনে নিতে স্বীকৃত হলেন।[২৯] কিন্তু এই সমঝোতার পরও লাউটাবাহাদুরপুরের পুলিশ ক্যাম্প লুট, কৃষকদের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, মহিলা নিগ্রহ ও ধর্ষণ এবং বিদ্রোহী কৃষকদের গ্রেফতার ও অত্যাচারের কেন্দ্র হিসেবে কাজ অব্যাহত রাখে। পুলিশী নির্যাতনের ব্যাপারটাকে 'চিরন্তন ঈদের রাজ্যে' 'ছোট কেয়ামতের' আগমন হিসেবে দেখেন ক্ষতিগ্রস্ত এক কৃষক মহিলা। তার ঘরবাড়ীও পুলিশ লুট করেছিল।[৩০] ১৯৪৯ সনের ১৮ আগষ্ট 'গরীবের পাকিস্তান' দাবীতে এক বিরাট কৃষক সমাবেশের উপর পুলিশ হামলা চালায় ও গুলিবর্ষণ করে। এতে পাঁচজনের মৃত্যু হয়। বিয়ানীবাজার থানায় ইপিআর বাহিনী পাঠানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত 'দুর্যোগ কবলিত' ১৫টি গ্রামকেই দমন করা হয়।[৩১] স্বাধীনতার পূর্বে যে সকল জায়গায় কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল সে সব স্থানে কৃষক সংগ্রাম বিক্ষিপ্তভাবে অব্যাহত থাকে।

১৯৪৮ সনের মার্চ মাসের মধ্যেই কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে কম্যুনিষ্টরা রণদিভে লাইন গ্রহণ করে। এটি ছিল পর্টির নতুন সম্পাদক বি,টি রণদিভের নামানুসারে। এই সময়ে তেভাগা সম্পর্কে পার্টির আনুষ্ঠানিক নীতি নিম্নোক্ত ভাষায় সংগ্রামরত কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও আশা আকাঙ্ক্ষার সার-সংক্ষেপ করেঃ

> কৃষকেরা এবছরে তেভাগার সংগ্রামে যেতে চাচ্ছেন, কিন্তু এ বছরে শুধু তেভাগা নয়, পুরো শস্যই তাঁদের বাড়ীতে উঠাতে হবে, কেননা যেকোন ক্ষেত্রেই সরকার ও জোতদারদের পক্ষ হতে ওরা সবচেয়ে বড়ো আঘাতের আশংকা করছেন। তাঁদের সন্দেহ আছে আমরা তাঁদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি কিনা। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, সংগ্রাম ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। এর ভিত্তিতে রয়েছে সাংবিধানিক ভাঁওতাবাজি আর তেভাগা আদায়ে তাঁদের সংগ্রাম-সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস।[৩২]

এটা সত্য যে, কম্যুনিস্ট পার্টির নতুন লাইন সরকারের লেভী ও খাদ্য শস্য সংগ্রহ নীতির বিরুদ্ধে হাজং, নানকর, সাঁওতাল, নমশুদ্র ও দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের মধ্যে চলমান প্রতিরোধে নতুন প্রেরণা দান করে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিল তেভাগা, টংক, নানকর পদ্ধতির খাজনা, জমিদারী ও মধ্যস্বত্বের অবসান নিয়ে সরকারী দীর্ঘসূত্রিতার কারণে হতাশা। কৃষকদের অস্থিরতা ঐ সময়ের বেশ কয়েকটি ঘটনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। হাজং, দালু ও দরিদ্র মুসলমান কৃষকেরা ময়মনসিংহের উপজাতীয় অঞ্চলে ভূসম্পত্তি আক্রমণ করে এবং শস্য গোলা লুট করে। শেষোক্তরা এই সব আক্রমণে নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহার করে, কর্তৃপক্ষ কিন্তু একে অপরাধী দলের কাজ হিসেবে দেখেন।[৩৩]

কৃষক বিদ্রোহীরা ৪০০ গ্রামের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে দখলকৃত জমি বিতরণ করা হয়। সরকারী সংস্থা থেকে লুন্ঠিত শস্য জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া হয় এবং ঔপনিবেশিক আইনানুগ কাঠামো প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে গণ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনগণ ভূস্বামীকে অতিরিক্ত খাজনা এবং সরকারকে কর দেয়া বন্ধ করে দেন।[৩৪]

রাজশাহীর নাচোল ও নওয়াবগঞ্জে সাঁওতালেরা বর্গাচাষীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। এখানকার কৃষকদের নেতা ছিলেন মাতলা সরদার। এঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ইলা মিত্র ও তাঁর স্বামী রমেন মিত্রের নেতৃত্বাধীন একদল স্বল্পসংখ্যক কম্যুনিস্টের। এঁরা তেভাগার জন্য যে আন্দোলন করেন তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৩২ সনে জিতু সরদারের নেতৃত্বে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহে অন্যতম অংশগ্রহণকারী রামু সরকারও এই বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।[৩৫] নাচোলের কুড়ি বর্গমাইল এলাকায় এরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এর প্রতি দুমাইল অন্তরে গ্রাম্য সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও সশস্ত্র কৃষক রক্ষীদের মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[৩৬]

বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে এক গোপন আক্রমণে সাঁওতালেরা পাঁচজন পুলিশ সিপাই ও একজন কর্মকর্তাকে নিহত করেন। ফলস্বরূপ এ এলাকায় শত শত পুলিশ

পাঠানো হয়। কৃষকদের গ্রেপ্তার করা হয় ও তাঁদের উপরে গুলি চালানো হয়। বাইশজনকে পিটিয়ে মারা হয়। অনেকে অত্যাচারের শিকার হন, শত শত সাঁওতাল ও হিন্দু কৃষক ভারতে পালিয়ে যান। কিছু সংখ্যক সাঁওতালসহ ইলা মিত্র গ্রেপ্তার হন। ইলা মিত্র আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে দৈহিক নিপীড়ন ও ধর্ষণের অভিযোগ আনয়ন করেন।[৩৭]

এছাড়াও, খুলনার বৈঠাঘাটা, ডুমুরিয়া ও বাগেরহাট থানায় হিন্দু তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকেরা সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলেনঃ উদ্দেশ্য ছিল চাষীর কাছে জমি, জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ, কৃষকদের কাছে খাস জমি প্রত্যাবর্তন এবং তেভাগার দাবী আদায়। বাগেরহাটের কালশিরা গ্রামের একজন কম্যুনিষ্ট কর্মীকে গ্রেফতারের সময় একজন পুলিশ একজন মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। ফলস্বরূপ তফসিলীদের এক বিরাট জনতা সংগঠিত হয়ে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য পুলিশ দলকে আক্রমণ করে। ফলে একজন সশস্ত্র সিপাই নিহত হন এবং অন্য দুজন ও একজন সাব-ইন্সপেক্টর আহত হন। প্রতিশোধস্বরূপ স্থানীয় আনসাররা মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে সাম্প্রদায়িক অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন এবং পুলিশী সহায়তায় এসব গ্রামে অমানুষিক অত্যাচার সংগঠিত করেন। কৃষকদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত করে ভেঙেচুরে তছনছ করা হয়। কুড়িজনকে গ্রেফতার করা হয়। বিপুল সংখ্যক তফসিলী ভারতে পলায়ন করেন।

পূর্ব বাংলা ও ভারতের প্রচার মাধ্যমে অভিযোগ ও প্রতি অভিযোগের ছড়াছড়ি ঘটে এবং দুদেশের রাজনৈতিক নেতারা একে অপরকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির দায়ে অভিযুক্ত করেন। ফলস্বরূপ ১৯৫০ সনের ১০ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। তায়া জিনকিন তাঁর *রিপোর্টিং ইন্ডিয়া* বইতে পিয়ের দিলাঁ নামের কুমিল্লার এক ফরাসী বংশোদ্ভূত জমিদারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই ব্যক্তি খুলনার 'মূর্খ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে' কালশিরা ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমুহে পুলিশী অত্যাচারের তীব্রতার মাত্রা বুঝতে অক্ষমতার দায়ে অভিযুক্ত করেন। ম্যাজিস্ট্রেট মূর্খ বলতে যা বোঝায় সে ধরনের নিষ্পাপ ও সরল হয়তো ছিলেন না। আমার যুক্তি হচ্ছে প্রাক দেশবিভক্তি যুগে সরকারী কর্মকর্তারা কৃষক বিদ্রোহ দমনে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন ও তাঁদের মানসিকতাই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য দায়ী ছিল। হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের সম্পত্তি ও জীবন রক্ষায় কর্মকর্তাদের নিষ্ক্রীয়তার অভিযোগ আনয়ন করতেন। লিয়াকত আলী খানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য জে, এন মন্ডল ১৯৫০ সনের ৯ অক্টোবর তাঁর পদত্যাগ পত্রে বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার কিছু গ্রামে পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ আনয়ন করেনঃ

> আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও এসপির কাছে তদন্তের জন্য লিখি। স্থানীয় জনসাধারণের একাংশও এসডিও কর্তৃক তদন্তের প্রার্থনা করেন। কিন্তু কোন তদন্তই অনুষ্ঠিত হয়নি। এমনকি জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চিঠি প্রাপ্তির স্বীকৃতিও পাইনি।[৩৮]

ফরাসী বংশোদ্ভূত জমিদারের কাছে যাকে মূর্খতা মনে হয়েছিল পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের বিরোধী দলীয় সদস্যদের মতে তা ছিল স্পষ্টই বিশৃংখলা দমনে সরকারের সুচিন্তিতউদাসীনতা,[৩৯] এর ফলে দেশে আইন শৃংখলার অবনতিই উৎসাহিত হত। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহের কেন্দ্রসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ধর্মীয় পার্থক্য ও কুসংস্কারকে ব্যবহার করতো। সরকারী ব্যক্তিগণ ও মুসলিম লীগাররা মুসলমান কৃষকদের বলতেন, 'লেভী আর টংক প্রদানে অস্বীকৃতিতে আপত্তিকর কিছু নেই, তবে এ আন্দোলনে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।'[৪০]

বিভিন্ন স্থানে উপজাতীয়, তফসিলী ও এমন কি দরিদ্র মুসলমানদের সম্পত্তি লুণ্ঠনের আক্রমণে অনেক মুসলমান কৃষক শরিক হন।[৪১] ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সনের দেশ বিভাগেও যা হয়নি, তার চেয়েও অনেক বেশী হিন্দু ১৯৫০ সনের পরে পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে চলে যান। এই ভাবে একটি গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে সাম্প্রদায়িকতার খাতে প্রবাহিত করে গরীব কৃষকদেরকে নতুন রাষ্ট্রে তাদের ন্যায্য অবস্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় যারা সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে তারা হচ্ছে, নবগঠিত রাষ্ট্রের আমলারা। এবার সে দিকটি লক্ষ্য করা যাক, তাছাড়া আমার বক্তব্যের অন্যতম প্রধান দিকও সেটাই।

পাঁচ

১৯৩৫ সনের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের পরেই কেবল বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক উচ্চবর্গের সরকার পরিচালনার সুযোগ ঘটে। সরকারের গঠন এমন ছিল যে, মন্ত্রী হিসেবে এঁরা নির্বাহীদের উপর নির্ভশীল ছিলেন। এটা বিশেষভাবে সত্য ছিল সংকটের সময়। নির্বাহীদের সংকট মোকাবিলা করার ক্ষমতাও ছিল এবং আপাতদৃষ্টিতে প্রশিক্ষণও ছিল। পরাধীন ভারতে শাসিতদের প্রতি নির্বাহীদের একটি নিরপেক্ষতার আবরণ ছিল। শাসিতদের উপলব্ধি আর কার্যকলাপ নিয়মিত প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ হত এবং বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক পরিশ্রবণের মধ্যে দিয়ে যেয়ে তা পরিশেষে মন্ত্রীদের কাছে সচিবদের প্রদত্ত পরামর্শের ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিদ্যমান গণ অসন্তোষ সম্পর্কে মন্ত্রীদের বীক্ষণ ও বোধ অনেকাংশেই সিভিল সার্ভেন্টদের উপলব্ধি দ্বারা প্রভাবিত হত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ন্যায় জনভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপস্থিতিতে জনপ্রিয় আন্দোলন ও সমস্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিভিল সার্ভিসের উপর মুসলিম রাজনীতিবিদদের নির্ভরশীলতা প্রায় সম্পূর্ণ ছিল।

১৯৪৭ সনের ডিসেম্বর মাসেই পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্য সচিব এক গোপন স্মারকে ভূমিজ বিক্ষোভের প্রতি সকল সরকারী সংস্থার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি এজন্য কম্যুনিস্টদের দায়ী করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ১৯৪৭ সনের ১৮ জানুয়ারী

তারিখে স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত স্মারক অনুসরণ করতে মনে করিয়ে দেন। তাঁর কাছে একই বছরের জানুয়ারী আর ডিসেম্বরের মধ্যে কোন পার্থক্যও ধরা পড়েনি। তাঁর স্মারকে ১৪ আগস্টের কোন স্থানই ছিলনা। তিনি কর্মকর্তাদের এ সকল বিরোধ আপোষে মিটিয়ে ফেলার জন্য তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাতে এবং গন্ডগোল তীব্র ও বিস্তৃত হলে জোতদারদেরকে ফসলের ৬০ঃ৪০ বিভাগে রাজী হতে উদ্বুদ্ধ করতে পরামর্শ দেন। এটা করতে গিয়ে তাঁদেরকে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বিক্ষোভকারীদেরকে গন্ডগোল সৃষ্টি করতে না দিতে নির্দেশ দেয়া হয়।[৪২] যদিও একটা নির্বাচিত সরকার সে সময়ে দেশ চালাচ্ছিলেন তথাপি সিভিল সার্ভিসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যায়। প্রচলিত রীতিতে জমিদার-কৃষকদের মধ্যে সমান ভাগের বিরুদ্ধে এই ৬০ঃ৪০ বিভাজনের প্রস্তাব দেয়া হয় অথচ কৃষকেরা চাচ্ছিলেন দুই-তৃতীয়াংশ। জোতদারগণকে বুঝিয়ে রাজী করা যাবে এই প্রত্যাশায় ৬০ঃ৪০ বিভাজনের প্রস্তাবটি গোপনভাবে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানানো হয়। যদি এই প্রস্তাব ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক প্রকাশ্যে জানানো হত, হয়তো আন্দোলন নতুন পথে যেত এবং কিছু মূল্যবান জীবন রক্ষা পেত।

কিন্তু প্রাক-দেশ বিভাগ কালের মতোই, ভট্টাচার্য যেমন লক্ষ্য করেছেন, সরকারী কৌশল ছিল শুধু সরকারী কর্মচারীরাই জমিদার-কৃষক বিরোধের মীমাংসা করবেন এবং এতে কম্যুনিস্টদের কৃতিত্ব দেয়া চলবে না।[৪৩] ১৯৪০ সনের জুনের প্রথমার্ধের চট্টগ্রাম বিভাগের গোপন পাক্ষিক প্রতিবেদনে এভাবে নীতি প্রণয়ন করা হয়েছিলোঃ *জমিদারদের রাজনৈতিক দালালদের মাধ্যমে কৃষকদের অনুরোধ বিবেচনার বিরুদ্ধে সর্তক করে দিতে হবে।'* লক্ষণীয় যে এই 'সতর্ক' শব্দটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'বুঝিয়ে রাজী করা' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু একই স্মারকে এটিও যোগ করা হয়েছিলো যে, জোতদারেরা যদি ফসলের ৬০ঃ৪০ বিভাজনে সম্মত না হন, তবে তাঁদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিন যে সরকার তাঁদের জন্য আরও কম স্বার্থরক্ষাকারী আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হবে। 'বুঝিয়ে রাজী করা' থেকে 'সতর্ক করার' বিবর্তনেই আমলাতন্ত্রের এক ধরনের বোনাপার্টিস্ট ভূমিকার প্রতি প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সিভিল সার্ভেন্টরা কৃষকদের শ্রেণী ধারণার প্রতি বৈরী ছিলেন। রাজযুগে কৃষকদের প্রতি তাঁদের আচরণ ছিল মা-বাপ সম্পর্কের মতো। তাই কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপ্রবেশ তাঁদের কাছে অসহনীয় ছিল। তাঁরা আরো বিশ্বাস করতেন যে, জমিদারী অত্যাচার থেকে কৃষকদের তাঁরাই একমাত্র রক্ষাকারী ছিলেন। যেমন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হাজং বিশৃংখলা সম্পর্কে সার সংক্ষেপ পেশ করতে গিয়ে জেলা প্রশাসক জানান, *'জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একজন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাসম্পন্ন স্টাইপেন্ডারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে।'*[৪৪] এই সঙ্গে কৃষকদের যে কোন উদ্যোগ, যা শাসক অভিজাতদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল, তাকে তাঁদের পক্ষ থেকে সচেতনতাহীন, নির্বিকার, স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ হিসেবে অভিহিত করা হত। দরিদ্রদের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষায় যে কোন কাজকেই সর্বদা

চক্রান্তমূলক বলে ব্যাখ্যা করা হত। তাই শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে করা হয়নি এমন যে কোন সমাবেশ সন্দেহের চোখে দেখা হত। ১৯৪৭ সনের পরিবর্তনের পরেও সদাশয় স্বৈরশাসন শেষ হয়ে যায়নি।

পুর্বোল্লিখিত স্মারকে কৃষকদের জন্য একটা দরদ প্রকাশ পায়। কিন্তু তার উৎস ছিল শ্রেণী রাজনীতির ভীতি ও নতুন রাষ্ট্রের সাংগঠনিক দুর্বলতা। জাতীয়তাবাদী মুসলিম উচ্চবর্গ পাকিস্তান প্রাপ্তির পর পর সংগ্রামী কৃষকদের পক্ষ থেকে যে সংকটের সম্মুখীন হয়, নির্বাহীগণ ঐ শ্রেণীর পক্ষ থেকে তাকেই মোকাবেলা করছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় নির্বাহীগণ ভূমি ও মালিকানা সংস্কারের মাধ্যমে আত্মসম্মানের জন্য কৃষককূলের স্বতঃস্ফূর্ত দাবীকে রাজনীতির মূলধারার বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাঁদের পূর্বসূরীদের ন্যায় এই কর্মকর্তাদের আইন–শৃংখলার প্রতি হুমকির প্রধান কারণকে দেখতে ব্যর্থ হন। কৃষকদের সমস্যাকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, যা কেবল প্রশাসনিক পন্থায় সমাধান করা সম্ভব। এভাবে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক কৃষকদের আন্দোলনকে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক সারবত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিভাগীয় কমিশনার ও দপ্তর প্রধানদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলনের আবির্ভাবের কারণে সরকারকে 'মূলত একটা প্রশাসনিক সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে।'[৪৫] কৃষক আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠী শুধু বহিরাগত ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রীদেরই দেখতেন। কৃষক আন্দোলনের উপর সমুদয় প্রতিবেদন শুধু উপমা আর গালিগালাজেই ভরপুর থাকত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এতে পরিষ্কার ষড়যন্ত্রের একটা ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঔপনিবেশিক পূর্বসূরীর কথা প্রতিধ্বনিত করে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হাজং বিদ্রোহের বর্ণনা এভাবে দেন, '*(হাজংরা) কম্যুনিষ্টদের দয়ার উপর নির্ভরশীল এবং তাঁদের প্রধান নেতারা হচ্ছেন উচ্চ বর্ণীয় হিন্দু।*'[৪৬] ২৮ জানুয়ারী সংসদ সচিব মুখ্য সচিবের কাছে তাঁর পত্রে তাঁকে হাজংদের আদি বাসস্থান স্থাপনের ধ্বংসাত্মক আন্দোলন সম্পর্কেও সতর্ক করে দেন।[৪৭]

নানকর কৃষকদের বেলায়ও একই বক্তব্য জাহির করা হয়। অশিক্ষিত, স্থূল এসব লোকেরা নিজেদের স্বার্থই বুঝতে অক্ষম।[৪৮] অথচ কর্মকর্তারা দু–একটি ক্ষেত্র বাদে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে মোটেই উল্লেখ করেননি। উপজাতীয় হাজংদের ক্ষেত্রে অবশ্য একজন কর্মকর্তা স্বীকার করেন যে, উপজাতীয়রা আরও প্রাগ্রসর সমতল ভূমিবাসীদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, কিন্তু এই বোধোদয়ে কোন লাভ হয়নি। এমনকি ডেপুটি কমিশনারের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে জমিদার ও নানকরদের মধ্যে চলমান তিক্ত বিরোধ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলেও তা মূলত ছিল জমিদারদের পক্ষে পুলিশ ব্যবহার করার জন্য যৌক্তিকতা দাঁড় করানো এবং এই উপসংহারে পৌছান হয় যে, '*জমিদারেরা পুলিশী সাহায্য চাইতে বাধ্য হযেছে।*'[৪৯] গোয়েন্দা সংস্থার একটি প্রতিবেদনে

নানকর আন্দোলনকে একজন কম্যুনিষ্ট নেতার বাতিক ও ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপরায়ণতা হিসেবে অভিহিত করেন। সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা কর্মকর্তার ভাষায়ঃ

১৯৪৭-এর শুরুতে একজন মুসলিম জমিদারের মাধ্যমে কম্যুনিষ্ট নেতা অজয় ভট্টাচার্যের ভগ্নী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে তিনি নানকর আন্দোলন জাগিয়ে তোলেন।[৫০]

যদি নানকর বিদ্রোহ সম্পর্কে কর্মকর্তাদের ধারণা এই হয়ে থাকে, তবে আন্দোলনের গতিধারা সম্পর্কে উপসংহার আর কি হতে পারতো? আবিষ্কারের ভাব নিয়ে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে কম্যুনিষ্টদের নানকর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলের মুসলিম জমিদারগণ।[৫১] পক্ষান্তরে হাজংদের শত্রু হিসেবে বর্ণনা করা হয়। একজন কর্মকর্তার মতে হাজংরা কখনও সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের স্বীকৃতি পাননি।[৫২] প্রকৃতপক্ষে হাজংরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতির নিকটতম অবস্থানে যান তখন, যখন এক পুলিশী গুলিবর্ষণের পরে তাঁদের একজনকে এক তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট *'আপাত দৃষ্টিতে একটা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক'*[৫৩] হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে কেন? এজন্য যে, কর্মকর্তারা অন্য জাতি, গোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রের সমমানের নাগরিক হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না। ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ তখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রেও তার কর্মকর্তাদের বুদ্ধিভিত্তিক কাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেনি। যদিও ক্ষমতাসীন দলের কিছু সদস্য সময়ে সময়ে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই জাতির লক্ষ্য, এ মর্মে তাঁদের ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন।

হিন্দু ও কম্যুনিষ্টদের উপস্থিতির কারণে বিদ্রোহী কৃষকদের দমনে মাঠ কর্মকর্তাদের আস্থার ভিত নড়ে উঠেছিল। জেলা গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ সুপারের প্রতিবেদনে এই দৃষ্টিভঙ্গী বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। তাঁর ধারণা ছিল হিন্দুরা ও কম্যুনিষ্টরা না থাকলে কৃষকদের যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথে আনা যেত। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বসমূহকে অবিরোধাত্মক দ্বন্দ্বে পরিণত করে শ্রেণী শাসন বজায় রাখাকে মৌল কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন, কিন্তু একাজে তাঁরা শক্তির ব্যবহারকে আপোষের চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেন। পুলিশ সুপার কর্তৃক 'সক্রিয় বিক্ষোভকারীদের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫৪] নির্বাহীগণ সামাজিক ভীতি তৈরীতেও মোক্ষম ভূমিকা রাখেন। যে পন্থায় কৃষক বিদ্রোহের এলাকার ঘটনাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়, তা থেকেই বিদ্রোহ-বিরোধী কার্যাবলীর দর্শন সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ অন্তরদৃষ্টি লাভ করা যায়। ১৯৪৯ সনের ১১ সেপ্টেম্বর এক গোপনীয় প্রতিবেদনে সিলেটের পুলিশ সুপার জানান, বড়লেখা থানাধীন সনেশ্বর সংলগ্ন মেহরীতে এক বিরাট শোভাযাত্রা রাষ্ট্রদ্রোহী শ্লোগান দেয় এবং এর ফলে ভীতি ও শংকার সৃষ্টি হয়।[৫৫]

কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারী উপলব্ধি সময়ে সময়ে অতিরঞ্জিত প্রতিবেদনের ফলশ্রুতি ছিল এবং এর ফলে ভীতি সঞ্চারের ঝোঁক সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সনের মাঝামাঝি সময়ে কর্মকর্তাগণ এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, জেলার নানকর বিদ্রোহ দমন কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এজন্য যদিও বা সরকারী আদেশের প্রয়োজন ছিল, কৃষকদের দমনের কাজ কোনভাবেই সরকারী আদেশের অপেক্ষা করেনি।[৫৬] মাঠ কর্মকর্তারা বিশেষত পুলিশ নিজ কর্তৃত্বেই ব্যবস্থা নিতে থাকেন, কখনও বা এসকল কার্যকলাপের নেতৃত্বে থাকতেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। ঔপনিবেশিক আমলেই এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল এবং পুলিশ বিধিমালায়ও তা স্থান পেয়েছিল। রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভেন্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তারা অবশ্য একই সুরে কথা বলতেন না। সংগ্রামী কৃষকদের দ্বারা আইন শৃংখলার হুমকীর বর্ণনা ভাষার গুরুত্বে ভেদাভেদ হত। উদাহরণস্বরূপ, সনেশ্বরে পুলিশী ব্যবস্থার পরে ঢাকার উচ্চ সরকারী মহলে তারবার্তা মারফত প্রথম যে খবর পাঠানো হয়েছিল, তাতে পরিষ্কারভাবে এই ঘটনার উল্লেখ করা হয় যে, পুলিশ গুলিবর্ষণের পূর্বে *'মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত গ্রামবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।'* কিন্তু পরবর্তী বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিবেদনে এটা প্রকাশ পায় যে, *'এটা ছিল একটি নিছক ভীতি।'*

কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কর্মকর্তারা যে ব্যবস্থা নেন, তা জনগণের ত্রাতা হিসেবে তাঁদের নিজ উপলব্ধি সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ১৯৪৮ সনের জানুয়ারীর প্রাথমিক পর্যায়েও একজন সরকারী কর্মকর্তা এই পরামর্শ দেন যে, সরকারের আদিবাসীদের বলা উচিত যে, তাঁদের বিশেষ প্রয়োজনাদি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এমনকি এই প্রস্তাব রাখেন যে, নবগঠিত গণ পরিষদে একজন উপজাতীয় প্রতিনিধি থাকা উচিত।[৫৭] এটা বিজয়ী জাতীয়তাবাদের প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা যখন অঙ্গীভূত হয়নি এমন সকল সামাজিক গোষ্ঠীর দাবীসমূহকে সহানুভূতির সাথে দেখা হত। উপজাতীয় ও কৃষক আন্দোলনের ব্যপ্তির সাথে সাথে আমলাতান্ত্রিক প্রতিকারের ধরণও ঔপনিবেশিক আমলের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। ১৯৪৯ সনের ১৯ এপ্রিল টংক আন্দোলন সম্পর্কে কমিশনারের প্রতিবেদন এইরূপঃ *"এলাকাটিতে আমাদের উপদ্রুত হিসেবে ঘোষণা করে শান্তিপ্রদানকারী পুলিশ মোতায়েন করা উচিত। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হতে পারে।"*[৫৮]

ঔপনিবেশিক পূর্বসূরী জেলা প্রশাসক ব্যাষ্টিনের মতো তিনিও একটি ফ্ল্যাগ মার্চের আয়োজন করতে বলেন। এ প্রতিবেদনে স্পীড বোট, একজন মন্ত্রীর এলাকা পরিদর্শন, ব্যাটারী সংবলিত একটি বাকযন্ত্র সমাধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পায় কিন্তু এতে যা ছিল না তা হচ্ছে ত্বরিত ভূমি সংস্কারের কথা। কখনও বা উপনিবেশিক কৃষক আন্দোলন দমনের অভিজ্ঞতা ছিল এমন সকল কর্মকর্তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে আনা হয়। একজন কম্যুনিষ্ট কর্মীর ভাষায়, ইংরেজ শাসনামলে নানকর আন্দোলন দমনে কুখ্যাতি অর্জন

করেছিলেন এমন সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদেরকে পদোন্নতি দিয়ে সিলেট জেলায় বদলী করা হয়।[৫৯]

মাঠ পর্যায়ের নির্বাহীগণ, উচ্চ পদে আসীন সিভিল সার্ভেন্টরা যে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণের নীতি অবলম্বন করতেন, তা যথাশীঘ্র সম্ভব ঝেড়ে ফেলে দিলেন। যতীন্দ্রনাথ ভদ্র[৬০] উথাপিত মূলতবী প্রস্তাবের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জন্য তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে ডেপুটি কমিশনার একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাকে লেখেন, '*আমি আশা করছি সরকার এই নির্বুদ্ধিতা ও রাষ্ট্রের শত্রুদের পক্ষ থেকে এই ভিতি প্রদর্শন সহ্য করবেন না। এবং এদেরকে যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে পরাস্ত করবেন।*'[৬১] তিনি ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের উদাহরণ নন, বরঞ্চ তৎকালীন সিভিল সার্ভিস দর্শনের অনুসারীর দৃষ্টান্ত। সিভিল সার্ভেন্টরা ক্ষমতাসীন দলের কোন নির্দেশ বা নীতিমালা অনুসরণ করছিলেন না। বরঞ্চ তাঁরা ক্ষমতাসীন দলকে চালাচ্ছিলেন এবং তাঁরা যে সমস্যার মোকাবেলা করছিলেন, তার সমাধানে অগ্রণী হচ্ছিলেন।

প্রাদেশিক গভর্ণর যখন রাজের শেষ দিনগুলোতে হাজং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যে সকল মোকদ্দমা রুজু করা হয়েছিল, তা যথাশীঘ্র প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিলেন, ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। গভর্ণরের নোট থেকে স্পষ্ট যে ক্ষমতাসীন দল মোকদ্দমা প্রত্যাহারের চিন্তা করছিলেন। গভর্ণরের বক্তব্যানুযায়ী হাজংদের মূল সমস্যা ছিল ইংরেজ আমলের 'গোলযোগ' থেকে উদ্ভুত ফৌজদারীমোকদ্দমা।[৬২] কিন্তু সরকারের সহকারী সচিবের কাছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মত দেন যে, '*মোকদ্দমা প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি বাদ দেয়া উচিত এই কারণে যে, বাদী পক্ষ ইতিমধ্যে আদালতের সম্মুখে সম্ভাব্য সকল সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করে ফেলেছে।*'[৬৩] আর এভাবে ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক হাজংদের দাবীর একটা রাজনৈতিক সমাধানের পদক্ষেপ আমলাতন্ত্রের সংকীর্ণ আইনগত দৃষ্টিভঙ্গীতে আটকা পড়ল। এ আমলাতন্ত্র ঔপনিবেশিক শাসন উত্তীর্ণ হয়ে জাতীয় সরকারের যুগেও স্থায়ী হয়েছিল।

কৃষক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক সমাধানের প্রক্রিয়াকেই শুধু বিকৃত করেনি, তাঁরা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্বেরও অবাধ্য হয়। পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজন কৃষক কর্মীর কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাওয়াজা নাজিমুদ্দিন অনতিবিলম্বে তদন্তের নির্দেশ দেন।[৬৪] মুসলিম লীগ কর্তৃক নানকর সমস্যার সমাধানের পরে ১৯৪৮ সনের ১লা এপ্রিল এসকল অত্যাচার সংঘটিত হয়। নানকরদের বিরুদ্ধে পুলিশী পাশবিকতার ধরণ মুখ্যমন্ত্রীকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। মুখ্য সচিবের কাছে এক নোটে ১৯৪৮ সনের ১লা এপ্রিল নাজিমুদ্দিন সুস্পষ্টভাবে তাঁর ক্রোধের কথা জানিয়ে দেন, '*যদি এসকল কথা সত্য হয়, তবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠিনতম শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে।*'[৬৫]

১৯৪৮ সনের ৪ আগষ্ট এডিসি আর ৩১ আগষ্ট ডিসি দুটি ভিন্ন প্রতিবেদনে এই সিদ্ধান্ত দেন যে, অভিযোগকারীর দরখাস্তটি অতিশয়োক্তিতে ভরপুর ছিল। এডিসি যদিও বা পুলিশী অত্যাচারের মাত্রা অতিক্রমের কথা স্বীকার করেন, ডিসি প্রস্তাব রাখেন যে, অভিযোগের উপর কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না গ্রহণের একটা কারণ ছিল এই যে, অভিযোগকারী কম্যুনিষ্ট বলে কথিত।[৬৬] প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। ইসমাইল আলী দেশ বিভাগ পূর্বে কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। কিন্তু সিলেট গণভোটের সময় পার্টির নীতির কারণে তিনি স্থানীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন।[৬৭] ঘটনার এক বছর পরেও এ ঘটনার উপর কোন সরকারী প্রতিবেদন তৈরী করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক দাবীকৃত ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা, আমলাতন্ত্রের চোখে বিষয়টি সময় গড়ানোর সাথে সাথে তাঁর গুরুত্বও হারিয়ে ফেলে। ইসমাইল আলীর দরখাস্তটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং ইত্যবসরে নাজিমুদ্দিনের স্থলে নুরুল আমিন আসেন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে।

বিচার বিভাগের নিম্নতর পর্যায়ের প্রতিবেদনে মাঝে মধ্যে কৃষক আন্দোলনের গ্রাম সমূহে সরকারী দমন নীতির বিষয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করা হয়, কিন্তু এসকল ক্রটির জন্য কদাচ ব্যবস্থা নেয়া হয়। পক্ষান্তরে সরকারী ভাষ্য যতোই উপরের পর্যায়ে যেতে থাকে, ততোই পুলিশী নির্যাতনের আকৃতি কমতে থাকে, আর সংগ্রামী কৃষকদের আইন শৃংখলার প্রতি হুমকীর বর্ণনার মাত্রা বাড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সনেশ্বরের প্রথম পুলিশী গুলিবর্ষণের পরে যে বেতারবার্তা পাঠানো হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল *'ছয়শত লোকের এক জনতা'* তাঁদেরকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু বর্ণনার ধাপ যতোই বাড়তে থাকে, জনতার সংখ্যাও ততোই বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে এই সংখ্যায় সমগ্র গ্রামবাসীদেরকে (প্রায় দুহাজার) দেখানো হয় এবং তাদের সবার হাতেই মারাত্মক অস্ত্র ছিল বলে জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের হাতে ছিল জাঠা, সুলফি এবং লাঠি। এসবগুলোই শ্রমের সরঞ্জাম। প্রয়োজনে কৃষকরা তাঁদের নিত্যদিনকার আত্মরক্ষায় এসব ব্যবহার করতেন। রাষ্ট্রের সংঘবদ্ধ আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত শক্তির বিরুদ্ধে এই সরঞ্জামকে আইনানুগ কর্তৃপক্ষের কাছে ভীতিপ্রদ মনে হওয়ার কারণ ছিলনা, যদিও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতিবেদনে তাই দাবী করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে এসকল প্রতিবেদনে পুলিশী ব্যবস্থার এবং গ্রামবাসীদের উপর পুলিশী নির্যাতনের মাত্রা সম্পর্কে লক্ষণীয় নীরবতায় ভরপুর ছিল। যদি বা উর্ধতন কর্মকর্তারা মাঝে মধ্যে পুলিশী অত্যাচারের আধিক্য স্বীকার করতেন, জেলা প্রশাসকরা কোনো সময়ই তাঁদের প্রতিবেদনে এর উল্লেখ করতেন না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এসব প্রতিবেদনে পুলিশী গুলিবর্ষণের যৌক্তিকতা জাহির করা হত। কিছু কিছু সহানুভূতিশীল প্রতিবেদনে অবশ্য পুলিশী অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যেত, কৃষকদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন, নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ভেঙে চুরে তছনছ করা এবং সময়ে সময়ে কৃষক মহিলাদেরকে ধর্ষণ করার তথ্য এসব প্রতিবেদনে স্থান পেয়ে যেত। কিন্তু এই পুরাতন অত্যাচারের এখন একটা নতুন নাম দেয়া হল। নাচোল বিদ্রোহের কম্যুনিষ্ট নেত্রী ইলা মিত্র আদালতে জানিয়েছিলেন যে, পুলিশী হেফাজতে থাকার সময়

যখন তাঁকে অত্যাচার করা হয় তখন পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে *'পাকিস্তানী ইনজেকশন'* দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছিল।[৬৮]

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সরকার উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে শাস্তিপ্রদানের চেয়ে নিপীড়নকেই বেছে নেয়। আন্দোলনের কর্মীদেরকে শাস্তি দেয়া বা তথ্য বের করার জন্য অত্যাচার প্রয়োগ করা হচ্ছিল না, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করা থেকে বিরত রাখা। জেলা গোয়েন্দা শাখার পুলিশ সুপার ১৯৪৯ সনের ২১ আগষ্ট অন্তত সেভাবেই বিয়ানীবাজারে পুলিশী তৎপরতার পরিমাপ করেন। তাঁর প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, *'যে সকল আহত লোককে গ্রেফতার করা যায়নি এবং পালিয়ে গেয়েছে, তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোন সমর্থন অথবা সাহায্য পাচ্ছে না।'*[৬৯]

কর্মকর্তারা কৃষক ও জনপ্রিয় আন্দোলন দমনের জন্য ধর্মীয় বিরোধকে তিক্ত করার কাজেও লিপ্ত হচ্ছিলেন। রাষ্ট্র জনগণের নাগরিক আবেগকে বাদ রেখে তাঁদের আদিম আবেগের কাছে আহবান করাকে বেশী সুবিধাজনক বিবেচনা করে। ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৫০ সনে ময়মনসিংহে পুলিশ সুপার *'মুসলিমজনসাধারণের অনুভূতি ও উৎসাহ বৃদ্ধির'* লক্ষ্যে মুজাহিদ বাহিনী সংগঠন করেছেন।[৭০] এটা কোন বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তার ব্যতিক্রম নয়। এটি অন্তত আংশিক হলেও সরকারী মহলের ঘোষিত নীতি ছিল। ১৯৪১ সনের ২৭ অক্টোবর আনসারের পরিচালককে *'প্রচারণার বিষয়'* শীর্ষক প্রচারপত্র জারী করেন। এতে আনসারদের *'জাতীয় পুনর্গঠনের স্বার্থে প্রয়োজন হলে ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করা এবং সেই উদ্দীপনাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্বার্থে ব্যবহার করার'* পরামর্শ দেন।[৭১] কিছু কিছু নির্বাহীর কাছে এভাবে ধর্ম দেশপ্রেমিক আনুগত্য জোরদার করার শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়। যদিও এসকল বিদ্রোহে অনেক মুসলমান অংশগ্রহণকারী ও নেতার উপস্থিতি ছিল, তাঁদেরকে হিন্দু ও কম্যুনিষ্ট হিসেবে প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল এবং কখনও বা আন্দোলনের বিপথগামী অংশ রূপে ধারণা দেয়া হচ্ছিল।

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রতিবেদনে সংগ্রামরত কৃষকদের সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজন সম্পর্কে কোনোরূপ বাকচাতুর্য ছিল না। ১৯৪৮ সনের ১৮ আগস্ট পুলিশের একজন ডিএসপি ও একজন ম্যাজিস্ট্রেট সিলেটের এসপি ও ডেপুটি কমিশনারের কাছে একটি যৌথ প্রতিবেদন পাঠান। এই প্রতিবেদনে তাঁরা জানান যে, বিয়ানীবাজার ও বড়লেখা থানার দুর্গম অঞ্চলে হিন্দু অধ্যুষিত ১৫টি গ্রামে কম্যুনিষ্ট কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করেছে।[৭২] প্রাথমিকভাবে এই অঞ্চলে যাঁরা বসবাস করতেন, তাদেরকে ধারণাগত দিক দিয়ে দুভাগে ভাগ করা হত। একটি হচ্ছে মুসলিম ও আইন মান্যকারী হিন্দু এবং অন্যটি রাষ্ট্রের শত্রু। এই ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা মান্যকারী হিন্দুরা ছিলেন জমিদার এবং তারা কৃষক আন্দোলন দমন করার জন্য প্রতিপক্ষের সাথে সহযোগিতা করছিলেন।[৭৩]

কর্মকর্তাদের ধারণায় এদের কেউ কেউ এমনকি সম্মানিতও ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কিছু কিছু হিন্দু ভূস্বামী বিদ্রোহ দমনে কর্মকর্তাদের উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্রদান করেন। সময় সময় মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু অভিজাত শ্রেণীকে সহযোগিতার আহবান করেন এবং তাঁদের কেউ কেউ ভূমি সংস্কার ও আত্মবিকাশের জন্য কৃষক সমাজের সংগঠিত উদ্যোগকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টায় শরীক হন।[৭৪]

কিন্তু হিন্দু মুসলমানদের মধ্যকার এই উপলব্ধিগত ঐক্য ছিল ভঙ্গুর। শাসকগোষ্ঠী কৃষকদের দাবীকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের অবস্থান থেকে দেখতেন, পক্ষান্তরে কৃষক আন্দোলনের এলাকা সমূহের পুলিশী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদে যে আলোচনা হয় তাতে হিন্দু সদস্যগণ একই ধরনের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাকে সমর্থন করেন।[৭৫] হিন্দু অভিজাতদের উদ্দেশ্যে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী যে ঐক্যের আহবান জানান, তা অবিশ্বাসের কারণে দুর্বল হয়ে যায়। নির্বাহীগণ এই ধারণা পোষণ করেন যে, অসুবিধার সময় হিন্দুরা তাদেরকে ছেড়ে যাবে। তাই তাঁরা হিন্দুদের নির্দিষ্ট এলাকা সমূহে মুসলিম বসতি স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার এটা করার একটা সহজ পরামর্শ রাখেন, খাস মহলের আওতায় যে জমিই আসুক তা মুসলমানদেরকে প্রদান করা হবে। তিনি এমনকি এ পরামর্শও দেন যে, সিলেটের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভবিষ্যত খাসমহল ভূমির বন্দোবস্ত মুসলমান কৃষকদের সাথেই করা উচিত।[৭৬] ময়মনসিংহের হাজং এলাকাতেও একই পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। ফলস্বরূপ, কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত একটি বাংলা প্রচার পত্র অনুসারে ময়মনসিংহে দেড়লক্ষ বিঘা জমি রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করে।[৭৭] ১৯৫১ সনের ১৩ জুলাই প্রাদেশিক গভর্ণর তার ময়মনসিংহের সফর বর্ণনায় লেখেন যে, ১১,৫০০ জনকে (মুহাজির) আসাম সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় পুনর্বাসিত করা হয়েছে। কিছু পরিত্যক্ত হাজং বাড়ী শরণার্থীদের দেয়া হয়েছে।[৭৮] এর একটা পরিণতি এই ছিল যে, বিপুল সংখ্যক অমুসলিম পার্শ্ববর্তী ভারতে চলে যাচ্ছিলেন। ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যা শুরু হয়েছিল কৃষক আন্দোলন দমনের জন্য সরকারের কৌশল হিসেবে এবং নিঃসন্দেহে রাজের কাছে থেকে প্রাপ্ত শিক্ষানুযায়ী শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি দাঁড়ায় আইন–কানুন ও মানবিক অধিকারের সুস্পষ্ট ও নিদারুণলংঘনে।

কৃষক আন্দোলনের প্রতি এ জাতীয় কার্যক্রম শাসকগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতাকেই প্রকাশ করে। প্রথমত, আরও ক্ষমতাবান ও সংগঠিত ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদের ভয় ছিল। এই নিরাপত্তাহীনতা কর্মকর্তাদের চিন্তাভাবনাকে অস্বাভাবিক মাত্রায় প্রভাবিত করে। স্থানীয় কর্মকর্তারা প্রায় উল্লেখ করতেন যে, কম্যুনিজমের উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতীয় ডোমিনিয়ন।[৭৯] একই সঙ্গে বিদ্রোহী কৃষকদের সামাজিক গঠন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার সমীকরণের উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৯ সনের ২১ আগস্ট সিলেটের পুলিশ সুপার হাজার খানেক (সশস্ত্র) কৃষকের শোভাযাত্রার বর্ণনা দেন এভাবে যে, '*তাঁরা*

কম্যুনিস্ট এবং তাঁদের প্রত্যেকে ও সকলেই হিন্দু।' সুস্পষ্টভাবে একটা সমীকরণের তত্ত্ব হাজির করা হয়, আর এভাবে বিদ্রোহী কৃষক হিন্দু ও কম্যুনিস্ট শব্দগুলো সমার্থক হয়ে যায়। আমলাতন্ত্র ও মুসলিম লীগ রাজনীতিবিদ এই উভয়ের প্রেক্ষিত এই চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

আর এভাবে এমন এক প্রক্রিয়া শুরু হয় যার ফলে পাকিস্তান শব্দটির অর্থ ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার দিকে এগোতে থাকে, অপ্রত্যক্ষভাবে অমুসলমানরা জাতিসত্তার বহির্ভূত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সনের ডিসেম্বরের মতো প্রাথমিক পর্যায়ে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপজাতীয় জনগণের একাংশের মধ্যে 'পাকিস্তান ভীতির' নমুনা দেখতে পান।[৮০] ধর্মীয় সংহতির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সেই ভীতি ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের মন নতুন রাষ্ট্রে নিজ অবস্থানের সংজ্ঞা নির্ধারণ সম্পর্কে শংকাকুল করে তোলে। পক্ষান্তরে পাকিস্তান সম্পর্কিত আনন্দাতিশয্য মুসলিম কৃষকদের কিছু কিছু অংশকে 'পবিত্র ভূমিতে' নিজ অবস্থান সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে যে সরকারী ভাষ্য ছিল তা প্রকৃতপক্ষে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তৈরী হয়েছিল। এবং শুরু হয়েছিল মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রতিবেদনে। আর এ চূড়ান্ত প্রকাশ ছিল মুখ্যমন্ত্রীর আইন পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে। মুখ্যমন্ত্রী শুধু অন্যের তৈরী করা বর্ণনায় তার নাম ও পদ ধার দিয়েছিলেন। এই বর্ণনার উৎস ছিল ডেপুটি কমিশনারের অফিসে। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তার বর্ণনা তৈরী করেছিলেন। রাজের আমলে এ বিভাগটি সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্র অথবা সরকার বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তি ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য এই বিভাগটি বিদ্রোহ–বিরোধী সংস্থাপনের কেন্দ্রীয় সংগঠনে পরিণত হয়। জনসাধারণের চোখে এটি অদৃশ্য থাকতো। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী বৈরী মনে করে এমন যে কোন ধরনের গণ আন্দোলন ও গণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখীন হতো। প্রকৃতপক্ষে এই বিভাগটি ছিল রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের ডার্করুম। এতে গণ আন্দোলনের রঙিন ছবি তৈরী হতো এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা বিকৃতও হতো। বাস্তবিকই ডেপুটি কমিশনারগণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতেন। সিলেটের ডেপুটি কমিশনার মুখ্য সচিবকে লেখেন যে *'তার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বিগত আট মাসের গোয়েন্দা বিভাগের প্রতিবেদন দেখেই নানকর বিদ্রোহের সরকারী ভাষ্যের চূড়ান্ত খসড়া তৈরী করেছেন।'*[৮১]

ছয়

প্রাদেশিক পরিষদে দেয়া মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি কিভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলন দমন করতে যে উদ্যোগ সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে হারাচ্ছিলেন সেই

প্রক্রিয়ারই প্রমাণ। অন্যদিকে পরিষদে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিকে রাষ্ট্রের এমন এক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে যার আওতায় সরকারকে এর কার্যাবলীর জন্য বিশেষত পুলিশী অত্যাচারের জন্য জনপ্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করতে হতো। উপরন্তু এটা উপমহাদেশে রাজ কর্তৃক সৃষ্ট সরকারী মানসিকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য – সন্তুষ্টিদায়ক সাধারণীকরণ যার আওতায় জনগণের যে কোন সমাবেশকে বহিরাগতদের চক্রান্ত হিসেবে দেখানো যায়। জনগণের মধ্যে বাইরের কারসাজির এই প্রতিপাদ্য, তনিকা সরকারের কথায়, ঔপনিবেশিকদের কাছে অতি প্রিয় ছিল[৮২] এবং তা স্বাধীনতার পর পূর্ব বাংলার কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় আমলারা অব্যহত রাখেন। এভাবেই পাকিস্তানের ঠিক শুরু থেকেই সরকারী জাতীয়তাবাদের বক্তব্যে এর স্থান হয়ে যায়। এই ঠুলি পরা দৃষ্টিভঙ্গী শাসক গোষ্ঠীকে এক বিশেষ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণে প্রভাবিত করে। এর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের উপলব্ধি বজায় থাকে যা কিনা জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে ব্যহত করে।

ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার আনন্দাতিশয্য বৈপ্লবিক দাবীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক/উপজাতীয় আন্দোলনকে পূর্ণজীবন দান করে। তখন জাতি গঠনের কাজের অর্থই ছিল এ সকল আন্দোলন ও তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনাকে এমনভাবে মোকবেলা করা যাতে জনগণের একতা বিনষ্ট না হয়। নতুন রাষ্ট্রের এ দুয়েরই প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল। অন্য কথায় যে কোন ধরনের বিরোধীপক্ষকে প্রান্তীয় অবস্থানে ঠেলে দেবার জন্য কর্তব্য শুধু দমনমূলকই নয়, আদর্শগতও ছিল এবং একই সাথে নিজ বৈধতাকে দৃঢ় করার জন্য শাসকগোষ্ঠী কী ধরনের ভাষা ও বাগধারা প্রয়োগ করবে? পাকিস্তান রাষ্ট্র যে বাগধারা সৃষ্টি করে তা শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ ও জাতিকে বিভক্ত করে। পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্র আরেক পা এগিয়ে কম্যুনিষ্ট আর হিন্দু শব্দদ্বয়কে সমার্থ করে। বস্তুত কৃষক আন্দোলন মোকাবিলা করতে যেয়ে সরকারী কর্মকর্তাগণ জাতিগঠনের তত্ত্ব তৈরী করার প্রক্রিয়ায় রত হন। তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় সংহতির প্রতি আবেদন জানিয়ে জাতিকে বিভক্ত করেছিলেন। যদিও ঔপনিবেশিকোত্তর জাতীয়তাবাদের আপাত লক্ষ্য ছিল জাতিকে একীভূত করা। আর এভাবেই এ নতুন রাষ্ট্র পূর্ববর্তী সমস্ত ভেদাভেদ অতিক্রমকারী বাস্তবতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১। দেখুন, আহমেদ কামাল, 'এ ল্যান্ড অব ইটারনাল ঈদ' – ইন্ডিপেন্ডেন্স, পিপল, এন্ড পলিটিক্স ইন ইস্ট বেঙ্গল।' *দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ষ্টাডিজ,* পার্ট–এ, ভলিউম ৪৬, নম্বর ১ (জুন ১৯৮৯)

২। সাদেক খান, 'অব মেন এ্যান্ড মাইট', হলিডে (ঢাকা) (এপ্রিল থেকে জুলাই, ১৯৮৬)

৩। দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন* ও *তৎকালীনরাজনীতি*, ২য় খন্ড (ঢাকা, ১৯৭৫), এবং অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫–৭৫, (ঢাকা, তারিখ নেই)

৪। দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, ১ম খন্ড, ঢাকা, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, (১৯৮৪)

৫। *ইষ্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বেলী প্রসিডিংস*, (এখন থেকে, ই, বি, এল, এ, প্রসিডিংস,) খন্ডঃ ৪, নংঃ ১, পৃঃ ১৪৮

৬। মাননীয় নূরুল আমীনের বক্তৃতা, *ই, বি, এল, এ, প্রসিড়িংস*, খন্ডঃ ৪, নংঃ ১, পৃঃ ১৬৪–১৭১

৭। তফাজ্জল আলীর বক্তৃতা, ১০ই মার্চ ১৯৫০, *ই, বি, এল, এ, প্রসিডিংস*

৮। অমল সেন, *নড়াইলের তেভাগা সংগ্রামের সমীক্ষা* (ঢাকা, ১৯৮০) পৃঃ ১৯–২০ এবং অজয় ভট্টাচার্য, *নানকরবিদ্রোহ*, ২য় খন্ড (ঢাকা, তারিখ নাই), পৃঃ ২৩৪–২৩৭

৯। জ্ঞানব্রত ভট্টচার্য্য, 'এ্যান এক্সামিনেশন অব লীডারশীপ এন্ট্রী ইন বেঙ্গল পেজ্যান্ট রিভোল্টস,১৯৩৭–১৯৪৭,' *জার্নাল অব এশিয়ান ষ্টাডিজ* (খন্ড XXXVII ঃ নংঃ ৪) পৃঃ ৬১৭

১০। প্রমথ গুপ্ত, *মুক্তিযুদ্ধেআদিবাসী* (কলিকাতাঃ ১৯৮২), পৃঃ ৮৮

১১। অজয়ভট্টাচার্য, *নানকর*, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৫৪

১২। এ্যাড্রিয়েন কুপার, 'শেয়ারক্রপিং এ্যান্ড শেয়ারক্রপারস স্ট্রাগল ইন বেঙ্গল, ১৯৩০–১৯৫০, পি এইচ, ডি *থিসিস* (লন্ডন ঃ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪), পৃঃ ৩৫২

১৩। প্রমথ গুপ্ত, *আদিবাসী*, পৃঃ ৮৮

১৪। *হোম, পলিটিক্যাল, বি–প্রসিডিংস*, (অক্টোবর ১৯৫০), নংঃ ৫১৯–৫২২

১৫। অজয়ভট্টাচার্য, *নানকর*, ২য় খন্ড, পৃঃ·২৫৩

১৬। কুপার, *থিসিস,পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৩৫৩–৩৫৪

১৭। জ্ঞান চক্রবর্তী, *কৃষক নেতা জীতেন ঘোষ* (ঢাকাঃ ১৯৭৭) পৃঃ ৩৩

১৮। *অজয়ভট্টাচার্য*, *নানকর*, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪০–২৫৪

১৯। *প্রাগুক্ত*

২০। *সংহতি* (সিলেট), (১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)

২১। অজয় ভট্টাচার্য, *নানকর,* ২য় খন্ড, পৃঃ ২৫৫

২২। *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২৫৮

২৩। *হোম, পুলিশ, বি–প্রসিডিংস,* এপ্রিল ১৯৪৮, নং ৬২০–২৬৫

২৪। সিলেটের এস, পি,'র গোপন নোট, ১১/৯/৪৯, *হোম, পুলিশ বি–প্রসিডিংস,* ডিসেম্বর ১৯৪৯, নংঃ ৩৯৯

২৫। হোম, পলিটিক্যাল, *বিপ্রসিডিংস,* (এপ্রিল ১৯৪৯), নংঃ ৪৬৮–৭০

২৬। *সংহতি,* (১১ই সেপেটম্বর, ১৯৪৭)

২৭। অজয় ভট্টাচার্য, *নানকর,* ২য় খন্ড, পৃঃ ২৮২

২৮। হোম, *পুলিশবান্ডিল* এবং উমর, *ভাষাআন্দোলন,* ২য় খন্ড

২৯। হোম, পলিটিক্যাল, *বি–প্রসিডিংস,* (জুলাই ১৯৪৮), নং ঃ ৫৫

৩০। ১৫/১২/৪৮ তরিখে এস, ডি, সি, কর্তৃক রেকর্ডকৃত প্রতিনিধির জবানবন্দী

৩১। এস পি, ডি আই বি সিলেটের নোট, হোম, পুলিশ, *বি–প্রসিডিংস,* (ডিসেম্বর ১৯৪৯), নংঃ ৩৫৩

৩২। সম্প্রতি প্রকাশিত সি, পি, আই–এর দলিলপত্রের অংশ বিশেষ, (জুলাই ১৯৪৯), পৃঃ ২৪৭–৯, উদ্ধৃত, কুপার, *থিসিস,* পৃঃ ৩৫৬

৩৩। হোম, পুলিশ, *বি–প্রসিডিংস,* নংঃ ৬০৬–১৫, নংঃ ১৪৩

৩৪। ক্রসরোড্স, মার্চ ১৭, এপ্রিল ২৮, ১৯৫০, এবং মনি সিং, *জীবন সংগ্রাম* (ঢাকাঃ ১৯৮৩)

৩৫। তনিকা সরকার, জীতু সাঁওতাল্স মুভমেন্ট ইন মালদা, ১৯২৪–১৯৩২; এ স্টাডি ইন ট্রাইবাল প্রটেষ্ট, রণজিৎ গুহ (সম্পাদিত) *সাবঅলটার্ণ স্টাডিজ,* খন্ডঃ ৪ (দিল্লীঃ ১৯৮৫)

৩৬। সত্যেন সেন, *বাংলাদেশেরকৃষকদেরসংগ্রাম* (ঢাকা, তারিখ নাই)

৩৭। *ব্লিট্‌স* (বোম্বে), ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫০

৩৮। মুহম্মদ গোলাম কবীর, *মাইনরিটি পলিটিক্স ইন বাংলাদেশ* (নয়া দিল্লীঃ ১৯৮০), পৃঃ ১৩৮

৩৯। *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১৩৮

৪০। মনি সিং, *জীবনসংগ্রাম,* পৃঃ ১২৫

৪১। *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১২৬–৭

৪২। হোম, পলিটিক্যাল, *বি–প্রসিডিংস,* (এপ্রিল ১৯৪৯), নংঃ ২৬৩–৪, *গোপনস্মারকলিপি*

৪৩। জ্ঞানব্রত ভট্টাচার্য, *লীডারশীপএন্ট্রী,* পৃঃ ৬৩২

৪৪। হোম, পলিটিক্যাল, *বি–প্রসিডিংস,* (এপ্রিল ১৯৪৮), নংঃ ৬১৮–১৯

৪৫। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিভিশনাল কমিশনার এবং বিভাগীয় প্রধানদের বার্ষিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা, ১০–১১ই জানুয়ারী ১৯৪৯, হোম, *পলিটিক্যালবান্ডিল,* নংঃ ১৪৭

৪৬। মুখ্য সচিবের কাছে ময়মনসিংহের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ৮/১/৪৮ তারিখে চিঠি, *হোম, পলিটিক্যাল, বান্ডিল,* নংঃ ৫৪

৪৭। হোম, পলিটিক্যাল, *বি–প্রসিডিংস,* (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯), নং ঃ ১৯৭

৪৮। প্রধানমন্ত্রীরবক্তৃতা; *ই, বি, এল, এ;* ২য় পরিচ্ছেদ

৪৯। সিলেটের ডি, সি'র কাছে হাকালুকির এস, ডি, সি'র রিপোর্ট, (৪/৮/৪৮), *হোম, পলিটিক্যালবান্ডিল,* নংঃ ৫৭

৫০। *হোম পলিটিক্যাল, বি–প্রসিডিংস,* ডিসেম্বর ১৯৪৯, নংঃ ২, সিলেটের ডি, এস, পি, আই, বি'র নোটস অন কম্যুনিষ্ট একটিভিটিস ইন বিয়ানিবাজার পুলিশ ষ্টেশন এ্যান্ড দি এডজয়েনিং এলাকা বিফোর এ্যান্ড আফটার দি পার্টিশন, (১৬/১১/৪৯)

৫১। *প্রাগুক্ত*

৫২। *হোম পুলিশ, বি–প্রসিডিংস,* (আগষ্ট ১৯৪৯), নং ৮–৯

৫৩। *হোম পুলিশ, বি–প্রসিডিংস,* (সেপ্টেম্বর ১৯৫০), নং ১–২

৫৪। পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবের কাছে ১৬/১১/৪৯ তারিখে ডেপুটি কমিশনারের চিঠি, *হোম পুলিশ বি–প্রসিডিংস,* (ডিসেম্বর ১৯৪৯), নংঃ ৩৫১–৩৫৭

৫৫। সিলেটের ডি,সি'র কাছে লেখা সিলেটের এস, পি, ডিআইবি'র গোপন চিঠির অংশ বিশেষ, *হোম পলিটিক্যাল বান্ডিল,* `নংঃ ৬৮

৫৬। হোম পুলিশ, *বি-প্রসিডিংস,* (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮), নংঃ ২২৮-২৪০

৫৭। চীফ সেক্রেটারীর কাছে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ৯/১২/৪৭ তারিখের চিঠি, *হোম পলিটিক্যালবি-প্রসিডিংস,* (অক্টোবর ১৯৫০), নংঃ ৫১২

৫৮। সনেশ্বরে গুলিবর্ষণের উপর চট্টগ্রামের কমিশনারের রিপোর্ট, *হোম পুলিশ, বি-প্রসিডিংস,* (আগস্ট ১৯৫২), নংঃ ১০২-৩০৯

৫৯। অজয় ভট্টচার্য, *নানকর,* ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯০-৩০৯

৬০। এ প্রবন্ধের ২য় পরিচ্ছেদ দেখুন

৬১। পূর্ব বঙ্গ সরকারে সচিবের কাছে সিলেটের ডি, সি'র ১৬/১১/৪৯ তারিখের চিঠি, *হোম পলিটিক্যালবি-প্রসিডিংস,* (ডিসেম্বর ১৯৪৯), নংঃ ৩৫১-৩৫৯

৬২। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের ময়মনসিংহ সফরের *ট্যুর নোট,* (২৫ জানুয়ারী, ১৯৪৮)

৬৩। *হোমপলিটিক্যাল,বান্ডিল* নং ঃ ৫২

৬৪। নানকর আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ইসমাইল আলী নামে একজন মুসলিম লীগ কর্মী ২৮/৩/৪৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। *হোম পলিটিক্যাল, বি-প্রসিডিংস,* (সেপ্টেম্বর ১৯৪৮), নংঃ ২২৮

৬৫। মুখ্য সচিবের কাছে প্রধানমন্ত্রীর ১/৪/৪৮ তারিখের নোট, *হোম পলিটিক্যাল, বান্ডিল* নংঃ৫২

৬৬। সিলেটের ডি'সি'র কাছে সিলেটের এ, ডি, সি'র নোট, *হোমপলিটিক্যাল,বি-প্রসিডিংস,* নংঃ২২৮-৪০

৬৭। অজয় ভট্টচার্য, *নানকর,* ২য় খন্ড, পৃঃ ২৫৩

৬৮। শিবদাস কর্তৃক রাজশাহী আদালতে ইলা মিত্রের জবানবন্দীর রিপোর্ট, *ব্লিটস* (বোম্বে, ২৩/১২/৫০)

৬৯। সিলেটের এস পি, ডি আই বি-র নোট

৭০। পূর্ব বঙ্গ পুলিশের এ আই জি'র কাছে ময়মনসিংহের এস পি-র ৬/১/৫০ তারিখের মেমো, *হোম পুলিশ বি-প্রসিডিংস* (নভেম্বর ১৯৫০) নং ১০৯২

৭১। পয়েন্টস ফর পাবলিসিটি, আনসার আলী, ২৭/১০/৪৮। ই,বি,জি,পি, ৪৯/৫০ ২৭৬৬এ–৬০০, *হোম পলিটিক্যাল, বান্ডিল* নংঃ ১৩৭

৭২। সিলেটের ডি সি, এবং এসপি'র কাছে বাহাদুরপুর ক্যাম্প থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, ১৪/৮/৪৯, *হোম পলিটিক্যাল বান্ডিল* নংঃ ৫৭

৭৩। উমর, *ভাষাআন্দোলন,* ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩৮

৭৪। ভূমি সংস্কারের উপর বিতর্ক; *ই, বি, এল এ, প্রসিডিংস,* খন্ডঃ ১ নং ঃ ৪

৭৫। এই প্রবন্ধের ২য় পরিচ্ছেদে যতীন্দ্রনাথ ভদ্রের মূলতবী প্রস্তাবের নোটিশ দেখুন, আরো দেখুন, কংগ্রেস সদস্যগণের প্রস্তাবের উপর আলোচনা, *ই, বি, এল, এ প্রসিডিংস,* খন্ড ঃ ৪ নংঃ ১

৭৬। পূর্ব বঙ্গ সরকারে সচিবের কাছে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের ১/৯/৪৯ তারিখের রিপোর্ট, *হোমপলিটিক্যালবান্ডিল* নং ঃ ১০৩

৭৭। দি ঢাকা গেজেট, *হোম পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, নোটিফিকেশন,* (সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৫০)

৭৮। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণরের ময়মনসিংহ সফরের *ট্যুর নোট,* (জুলাই, ১৯৫১), হোম পলিটিক্যাল বান্ডিল, জাতীয় মহাফেজখানা, ঢাকা

৭৯। সিলেটের ডি সি'র কাছে সিলেটের এস পি–র ১/৯/৪৯ তারিখের রিপোর্ট, *হোম পুলিশ, বান্ডিল* নংঃ ৭১

৮০। পূর্ব বঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট, ৯/১২/৪৯, *হোম পলিটিক্যাল বান্ডিল* নংঃ ৭১

৮১। পূর্ব বঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের কাছে সিলেটের ডি সি'র, ডি ও ১৬/১১/৪৯, *হোম পুলিশ বি–প্রসিডিংস,* (ডিসেম্বর ১৯৪৯), নংঃ ৩৫১–৫৭

৮২। তনিকা সরকার, জীতু সাঁওতাল, গুহ (সম্পাদিত) *সাবঅলটার্ণ স্টাডিজ,* খন্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ১৩৯